পাঁচ বিলিয়ন ডলারেই পারব

মোস্তাফা জব্বার

বাংলাদেশের সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা খাতের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন বাংলাদেশ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তথা বেসিস ২০১৮ সালের মধ্যে সফটওয়্যার ও সেবা খাতের রফতানি ১ বিলিয়ন ডলারে মানে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছানোর সঙ্কল্প ঘোষণা করেছে। ২০২১ সালে এটি ৫ বিলিয়ন ডলার করার অঙ্গীকারও রয়েছে। আমি সাধারণভাবে অনুভব করি, বেসিসের এই লক্ষ্যমাত্রাকে সহজে কেউ বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। সরকারি-বেসরকারি কোনো হিসেবেই এটি অর্জন করা সম্ভব, এমন কোনো অবস্থা বিরাজ করে বলে ধারণা পাই না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মাত্র কয়েক কোটি টাকা, রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো আরেকটু বেশি টাকা ও আইসিটি বিভাগ ৪০ কোটি ডলার রফতানির হিসেব দিয়ে থাকে। বাংলদেশ ব্যাংক এই হিসাব দেয় তাদের কাছে ব্যাংকের মাধ্যমে আসা ডলারের হিসাব করে। ইপিবি বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবের সাথে আরও কিছু যোগ করে। বস্তুতপক্ষে এদের কারও হিসাব সঠিক নয়। বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি রফতানির টাকা শুধু ব্যাংকে আসে না, নানা পথে আসে– অনেক টাকা আসেই না। এতদিন বেসিস নিজে হিসাব করে দেখেনি, তার সদস্যরা কী পরিমাণ রফতানি করে থাকে। গত ১৫ জুলাই বেসিসের সভাপতির দায়িত্ব নেয়ার পর আমার নিজেরই মনে হয়েছে, যোগ-বিয়োগটা তো নিজেরই করা উচিত। দেখি না আমার নিজের ঘরে কী হিসাব আছে। অবাক হওয়ার মতো ঘটনা, এটি যে আমার নিজের ঘরের হিসাবেই আমি ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি রফতানি করি।

স্মরণ করা যতে পারে, বেসিস একই সাথে তথ্যপ্রযুক্তির আরও অনেক খাতে ব্যাপক উন্নয়নের ওয়াদা করেছে। এসব লক্ষ্যমাত্রার মাঝে কর্মসংস্থান, ইন্টারনেট ব্যবহার বাড়ানো ইত্যাদি রয়েছে। বেসিসের এই স্লোগানটির নাম ছিল 'ওয়ান বাংলাদেশ'। বেসিস এই লক্ষ্য যখন স্থির করে, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন এটি এক ধরনের উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন। শুরুতে তেমন ধারণা আমারও ছিল। কিন্তু ২০১৬ সালে এসে আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছে আমরা সঠিকভাবে হিসাবটা করছি না বলেই অঙ্গীকারটিকে উচ্চাভিলাষী বলে মনে হচ্ছে। এখন আমার নিজের কাছে ২০২১ সালে ৫০০ কোটি ডলার রফতানির লক্ষ্যটাকেও বড় মনে হচ্ছে না। তবে এর জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেরও বেশ কিছু কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক হিসেবে বেসিসের এই স্বপ্নটাকে আমাদের সবারই স্বাগত জানানো উচিত। কারণ, আমাদের মতো দেশের অর্থনীতির জন্য রফতানিকে আশীর্বাদ দেশ হিসেবে গণ্য করতে হয়। বৈদেশিক মুদ্রা না থাকলে দেশটাকে তলাহীন ঝুড়ির দেশ মনে করা হয়। '৭২ সালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার আমাদেরকে তেমনটাই ভেবেছিলেন। সেজন্য আমরা রফতানির একটি বড় সফলতাকে হাতের মুঠোয় আনতে চাই। স্বপ্নটাও তাই অনেক বড়। কিন্তু আমরা এটিও মনে করিয়ে দিতে চাই, শুধু স্বপ্ন দেখাটাই বড় কথা নয়, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে কার্যকর এবং সঠিক কর্মপন্থা নিয়ে নীতি ও কৌশল অনুযায়ী পথ চলাটাও জরুরি।

আমরা কিছু সরকারি হিসাবের দিকে তাকাতে পারি। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের রফতানি আয় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১৯ শতাংশ কম ছিল। বিগত বছরের শেষ দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবে রফতানি আয় লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে পারেনি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হলেও আগের অর্থবছরের চেয়ে সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের রফতানি আয় বেড়েছে। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত সর্বশেষ রফতানি প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতের রফতানি আয় প্রথমবারের মতো ১০ কোটি ডলার ছাড়ায়। ওই অর্থবছরে খাতটি থেকে রফতানি আয় হয় ১০ কোটি ১৬ লাখ ৩০ হাজার ডলার। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাত থেকে রফতানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫ কোটি ৪৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার। অর্থবছরটিতে রফতানি আয় হয়েছে ১২ কোটি ৪৭ লাখ ২০ হাজার ডলার। তবে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হলেও ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় এ আয় ২৩ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরে এ খাত থেকে ১৩ কোটি ডলার রফতানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপরের রফতানি আয়ের হিসাবটি আমার হাতের কাছে নেই বলে এর পরের অগ্রগতির তুলনাটা করা গেল না। তবে এটি আমি জানি, সরকারি হিসাবে এতে আমূল কোনো পরিবর্তন নেই।

বলা বাহুল্য, স্বপ্নের তুলনায় এইসব হিসাব উল্লেখ করার মতো নয়। ১০ সেপ্টেম্বর '১৪ সকালে এইসব বিষয় নিয়েই কথা বলতে এসেছিলেন ভারতীয় দুটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দুই পরামর্শক। এদের একজন হলেন এয়ন হিউইটের নেইল শাস্ত্রী এবং আরেকজন থলনসের রবার্তো কার্লোস এ ফ্লরো। শাস্ত্রী ভারতীয়। ফলে বাংলাদেশ বিষয়ে তার জ্ঞান অনেক পাকা। ফ্লরো পুরো আলোচনায় কথাও কম বলেছেন। সম্ভবত এখনও তাকে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে হচ্ছে। ওদেরকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন কমপিউটার কাউন্সিলের জাহাঙ্গীর নামে এক কর্মকর্তা। অনেকক্ষণ আলাপ করার ফাকে তারা জানালেন, জনসম্পদ তৈরির বিষয়ে একটি স্বল্পকালীন রোডম্যাপ তৈরির পরিকল্পনা আছে তাদের। তখনকার বেসিস সভাপতিসহ অনেকের সাথেই তারা কথা বলেছেন। তাদের পরামর্শ যেরকম ছিল, তারচেয়ে আমার আলোচনাটি ▸

বিপরীত মেরুর এমন একটি মন্তব্য আমাকে বিস্মিত করেনি। আমি খুব ভালো করেই জানি, আমার কথাগুলো শ্রুতিমধুর লাগেনি। কারণ, আমি বলেছিলাম রফতানি আয় বাড়াতে দেশীয় বাজার বাড়াতে হবে। দেশীয় বাজার না বাড়লে কর্মসংস্থান হবে না এবং মানবসম্পদ গড়ে তোলার কাজটি সঠিকভাবে হবে না।

আমার বক্তব্যটি যে কেউ সহজে গ্রহণ করতে পারে না, সেটি হচ্ছে বাংলাদেশে বিগত সময়গুলোতে সরকার ও ট্রেডবডিগুলো নীতি ও কর্মপন্থার ক্ষেত্রে সঠিক পথে চলতে পারেনি বলেই এত ঢাকঢোল পেটানোর পরও আমরা আমাদের প্রত্যাশিত সফলতা পাইনি। এমনকি এখনও সফটওয়্যার রফতানি ও দেশীয় শিল্প খাত গড়ে তোলায় নীতি ও কর্মপন্থা সঠিক নয়। এসব যদি এখনও সঠিক পথে না চলে, তবে স্বপ্ন তো স্বপ্নই থেকে যাবে। ১০০ কোটি বা ৫০০ কোটি ডলারের স্বপ্ন পূরণের জন্য কিছু করণীয় বিষয়ে দুয়েকটি মোটা দাগের বিষয় নিয়ে কথা বলা যায়।

অভ্যন্তরীণ বাজার : আমি অতি বিনয়ের সাথে বলতে চাই, রফতানি বাড়ানোর প্রথম পূর্বশর্ত হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বাজার। এতদিন আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজার গড়ে তোলার সুযোগ ছিল না, তাই এই বিষয়ে বেশি কথা বলার সুযোগ ছিল না। তবে এখন আমাদের বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার রয়েছে। সেটিতে নিজেদের কাজ নিজেদের করার ব্যবস্থা করতে হবে। দুঃখজনকভাবে সরকার ও তথ্যপ্রযুক্তি খাত দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকে চরমভাবে উপেক্ষা করে যাচ্ছে। সব পক্ষেরই ধারণা যে দুবাই, নিউইয়র্ক, লন্ডন, জার্মানি ঘুরলেই সফটওয়্যার রফতানি বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে। তারা কোনোদিন হিসাব করে দেখে না, তথ্যপ্রযুক্তিতে রফতানির চেয়ে আমদানির পরিমাণ একেবারে কম নয়। শুধু অর্থ খাতে বাংলাদেশ যে পরিমাণ সফটওয়্যার ও সেবা আমদানি করে, সেই পরিমাণ রফতানি কি আমরা করি? অথচ ইচ্ছা করলেই আমরা বিদেশ-নির্ভরতা অনেকটাই কমিয়ে আনতে পারি। হতে পারে আমরা অপারেটিং সিস্টেম বা বড় ধরনের ডাটাবেজ সফটওয়্যার বানাতে পারব না, কিন্তু আমরা কি অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার বা ইআরপিও বানাতে পারি না? দেশীয় সফটওয়্যার শিল্প খাত গড়ে তোলার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল, সেগুলো তো সঠিকভাবে করা হচ্ছেই না, বরং যেসব পদক্ষেপ অভ্যন্তরীণ বাজার ও রফতানি দুই খাতেই সহায়ক হবে সেইসব কাজও আমরা গুছিয়ে করি না। কেমন করে জানি সংশ্লিষ্টদের এমন ধারণা হয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক আন্তর্জাতিক মেলায় অংশ নিলেই দেশ সফটওয়্যার রফতানিতে বিপুল অগ্রগতি সাধন করতে পারবে। সেজন্য কমডেক্স ফল থেকে সিবিট পর্যন্ত সব মেলাতেই আমাদের হাফডান অংশগ্রহণ হয়েই চলেছে। দেশের ভেতরেও সফটওয়্যার বা

সেবা খাত নিয়ে যেসব মেলার আয়োজন হয়, তাতে নানা পুরস্কার আর ঢাকঢোলে সময় যায়, সেলিব্রিটি তৈরি হয়, কাজের কাজ তো কিছুই হয় না। সফটওয়্যার ও সেবা খাতের বাজার তৈরির কোনো প্রচেষ্টাই চোখে পড়ে না।

আমি মনে করি, অভ্যন্তরীণ বাজারটাকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারলে সবচেয়ে বড় উপকারটা হতো মানবসম্পদ তৈরিতে। আমরা বিদেশে সফটওয়্যার ও সেবা রফতানির ভিতটা নিজের বাড়িতেই গড়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু এখন সরকারের ডিজিটালাইজেশনের বড় কাজগুলো তো বিদেশীরাই করছে, আমরা নিজেরা নয়। সেটি উল্টাতে হবে। এসব কাজ আমাদেরকে করতে দিতে হবে।

অবকাঠামো : অন্যদিকে সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ হলো, বেসরকারি খাত বা সরকার কেউই অবকাঠামোর কথা মোটেই ভাবে না। সেই '৯৭ সালে বরাদ্দ দেয়া কালিয়াকৈরের হাইটেক পার্ক এখনও চালু হয়নি। ২০১৭ সালে সেটি চালু হতে পারে বলে এক ধরনের আশাবাদ তৈরি হয়েছে। একটি হাইটেক পার্ক চালু করতে যাদের ২০ বছর লাগে, তারা কি শতকোটি ডলারের স্বপ্ন দেখতে পারে? মহাখালী আইটি ভিলেজের কথা তো ভুলেই থাকলাম। তবে এরই মাঝে যশোরের হাইটেক পার্ক চালু হয়েছে। চালু হয়েছে জনতা টাওয়ার। বিনামূল্যের প্রশিক্ষণও ব্যাপকভাবেই শুরু হয়েছে। এলআইসিটি ও হাইটেক পার্ক ছাড়াও বেসিসের নিজস্ব প্রশিক্ষণ রয়েছে। তবে সব ক্ষেত্রেই বড় সঙ্কটটির নাম কর্মসংস্থান। এর আগে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্প থেকে কর্মসংস্থান বস্তুত করাই যায়নি। কেউ কি অনুগ্রহ করে এটি অনুভব করবেন, অভ্যন্তরীণ বাজার তৈরি না হলে কর্মসংস্থান তৈরি হবে না? প্রশিক্ষণের পর যে চাকরি পাওয়া যায় না তার কারণ অভ্যন্তরীণ বাজার তৈরি হয়নি।

অবকাঠামোর কথা বললে আরও একটি বিশাল বিষয়ের কথা বলতে হবে। সেটির নাম ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ। সরকার ব্যান্ডউইডথের দাম কমালেও গ্রাহক পর্যায়ে এটি গলাকাটা। বিটিআরসি এ ক্ষেত্রে কোনো মনোযোগই দেয়নি। একই সাথে ফোরজি ও ক্যাবল ইন্টারনেটের দিকে নজর দিতে হবে। দেশের সব প্রান্তে ইন্টারনেট না পৌঁছিয়ে শতকোটি ডলারের বাজারের কথা ভাবাটাই সঠিক নয়।

বিলিয়ন পার করেছি : যদিও বিশ্বাস করবেন না তবুও আমার কাছে আসা তথ্য অনুসারে আমরা রফতানি আয়ে শতকোটি ডলার ছাড়িয়েছি। বেসিস অফিস আমাকে চমকে দিয়েছে। ওদের হিসাব অনুসারে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বেসিসের ২৭৭ সদস্য বিদেশ থেকে আয় করেছে ১৬৮.৬৫ মিলিয়ন ডলার (১৩২০,৯৭,৬৫,৩৪০ টাকা)। এই সময়ে তারা দেশের বাজারে আয় করেছে ৮০.৮২ মিলিয়ন ডলার (৬৩৩,০২,৭৬,৪৭০ টাকা)। পরের অর্থবছরে ৩৮২টি কোম্পানির হিসাবে বিদেশ থেকে আয় হয়েছে ৫৯৪.৭৩ মিলিয়ন ডলার (৪৬৫৮,৩১,৩৬,৮৩৭ টাকা)। অথচ দেশের আয় কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৭.২৪ মিলিয়ন ডলারে (২১৩,৩৭২৮,৬৯৬ টাকা)। এর মানে এক বছরে বিদেশের আয় বেড়েছে তিন গুণ আর দেশের আয় কমে হয়েছে এক-তৃতীয়াংশ। যদি শুধু আমার হাতের তথ্যটাকে পুরো দেশের তথ্যে দ্বিগুণ হিসেবে রূপান্তর করি, তবে রফতানি আয় প্রায় ১২০ কোটি ডলার হবে। দ্বিগুণ করার কারণটাও বলতে চাই। আমার বেসিসের সদস্য সংখ্যা হাজারের ওপর। বেসিসের সদস্য নয় এমন প্রতিষ্ঠানও হাজারের ওপর। আমি শুধু ৩৮২ প্রতিষ্ঠানের হিসাব পেয়েছি। অথচ আমার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দুই হাজার। এটি যদি আমি সামনের দিকে প্রবাহিত করি, তবে আমার গতি আরও বাড়বে এবং সেজন্য আমি ২০২১ সালে ৫০০ কোটি ডলার আয়ের স্বপ্ন দেখতেই পারি। কিন্তু পাশাপাশি আমাকে এটিও ভাবতে হচ্ছে, আমার অভ্যন্তরীণ বাজার আমার কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ সরকার ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করছে। সরকার ডিজিটাল হচ্ছে। কিন্তু আমার নিজের দেশের প্রতিষ্ঠানের কাজ কমছে। বিদেশীরা আমি যা রফতানি করি, তারচেয়ে বেশি টাকা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। তারা শুধু আমার মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছে না, আমার দেশের বেকারত্ব বাড়াচ্ছে। আমি নীতি-নির্ধারকদের কাছে অনুরোধ করব, তারা যেন আমাদের নিজের কাজ যাতে নিজেরা করতে পারি তার আয়োজন করেন। রফতানির বিষয়টি তারা আমাদের ওপর ছেড়ে দিলেই পারেন কজ

ফিডব্যাক :
mustafajabbar@gmail.com